মেহেরপুরে “অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা, অংশীজনের প্রত্যাশা” শীর্ষক মতবিনিময় সভা

মেহেরপুরে “অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা, অংশীজনের প্রত্যাশা” বিষয়ক এক মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার সকাল ১০টায় জেলা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কনফারেন্স রুমে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। গণসাক্ষরতা অভিযানের সহযোগিতায় মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এ সভার আয়োজন করে।

মউক-এর নির্বাহী প্রধান আশাদুজ্জামান সেলিমের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোঃ তরিকুল ইসলাম।

এসময় তিনি বলেন, প্রত্যন্ত গ্রামের শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেও অভিভাবকদের অসচেতনতার কারণে বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ে, যার দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব হিসেবে সরকারি পরিসংখ্যানে শিক্ষার হার তুলনামূলক কম দেখা যায়। তবে এখন কেন্দ্রীয় সরকার ও জেলা শিক্ষা প্রশাসনের কঠোর ও নিরবিচ্ছিন্ন তদারকিতে লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে। তিনি এ সময় শিক্ষার উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে সরকারি ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোর কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ হযরত আলী, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ রুহুল আমিন এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন মেহেরপুর জেলার উপপরিচালক এ. জে. এম সিরাজুম মুনীর।

এসময় বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, শিক্ষক সমিতির জেলা সভাপতি নাজমুল হক টিনু, আজগর আলী মাস্টার ও আব্দুর রব।

এছাড়াও এসময় সরকারি উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান ‘গণসাক্ষরতা অভিযান এর কর্মকর্তাসব সজিবুল ইসলাম ও সামসুন নাহার কলি উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের স্বাগত বক্তব্য রাখেন মউক এর নির্বাহী প্রধান

আশাদুজ্জামান সেলিম। তিনি বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সুবিধাবঞ্চিত ও পেছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে মূলধারায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে শিক্ষার্থীর ভর্তি বৃদ্ধি ও ঝরে পড়া শিক্ষার্থী হ্রাসে মউক কমিউনিটি ভিত্তিক এপ্রোচ পদ্ধতিতে এগিয়ে যাচ্ছে, যার মধ্যে ডোর টু ডোর ক্যাম্পেইন অন্যতম।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে এই কর্মসূচির প্রধান পৃষ্ঠপোষক গণসাক্ষরতা অভিযানের কর্মকর্তাবৃন্দ তাঁদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যে পৌঁছাতে সংস্থার নিজস্ব উদ্যোগকে সাফল্যভিত্তিক কার্যক্রম হিসেবে মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন।

এছাড়াও অনুষ্ঠানের মধ্যে এক মুক্ত আলোচনা সভায় উপস্থিত স্টেকহোল্ডারবৃন্দ মানসিকতার পরিবর্তন, মডেল মাদ্রাসা, মাদ্রাসা শিক্ষায় বৈষম্য, উপবৃত্তির অধিক বরাদ্দ, বিদ্যালয় শিক্ষকের স্বল্পতা, জেন্ডার বৈষম্য, পাঠ্যপুস্তক কারিকুলাম রচনায় যৌক্তিকতা এবং শিক্ষা প্রশাসনের তদারকির ধীরগতিসহ বিভিন্ন বিষয়ের চ্যালেঞ্জ ও সুপারিশসমূহ তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রী, সুশীল সমাজ ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার ৬০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন মউক এর মানবাধিকার কর্মী সাদ আহম্মদ ও মোছাঃ কাজল রেখা।

মেহেরপুরে বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস পালিত

“স্নায়ু বৈচিত্রকে বরণ করি, টেকসই সমাজ গড়ি” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মেহেরপুরে পালিত হয়েছে বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস।

দিবসটি উপলক্ষে আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে পুনরায় জেলা

প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এসে শেষ হয়।

পরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অটিজম সচেতনতা বিষয়ে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আসাদুল ইসলামসহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

এছাড়াও সমাজসেবা কার্যালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা র্যালিতে অংশগ্রহণ করেন। জেলা প্রশাসন ও জেলা সমাজসেবা কার্যালয় যৌথভাবে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

গাংনীতে ভূট্টাক্ষেত থেকে অজ্ঞাত ব্যক্তির অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার গোপালনগর মাঠের ভুট্টা ক্ষেত থেকে অর্ধগলিত অজ্ঞাত ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে গোপালনগর মাঠের আব্দুল খালেকের ভূট্টা ক্ষেত থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। মরদেহটি ক্ষত বিক্ষত অবস্থায় পুলিশ উদ্ধার করেছে। চেহারা দেখে সনাক্ত করা সম্ভব নয় বলে জানা গেছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

স্থানীয়দের বরাত দিয়ে তিনি জানান, ভুট্টা ক্ষেতে মরদেহটি দেখে পুলিশকে খবর দেন স্থানীয়রা। পরে ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহটি উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। সনাক্ত হলে ময়নাতদন্ত শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

স্থানীয়রা জানান, সম্প্রতি এই স্থানে পল্লী বিদ্যুতের নির্মাণাধীন লাইনের কিছু তার চুরির ঘটনা ঘটেছে। তার চুরি করতে এসে দুর্ঘটনায় এই অজ্ঞাত ব্যক্তি মারা যেতে পারেন বলে ধারণা করছেন স্থানীয়রা।

মেহেরপুরের কুতুবপুরে জামায়াতে ইসলামীর গণসংযোগ ও পথসভা

মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের তেরঘরিয়া ও রুদ্রনগরে জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে গণসংযোগ ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার (২১ এপ্রিল) বিকেল পাঁচটার দিকে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

পথসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির মাওলানা তাজউদ্দিন খান। তিনি বলেন, “জামায়াতে ইসলামী ক্ষমতায় গেলে দেশের মানুষ শান্তি পাবে। গত ১৬ বছর আমরা নির্যাতনের শিকার হয়েছি। আমাদের কোনো শান্তি ছিল না। স্বৈরাচার হাসিনার আমলে আমাদের অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। কোর্টের বারান্দায় যেতে যেতে আমাদের পায়ে আঘাত লেগেছে। আমার ভাইদের ওপর বিনা কারণে হামলা-মামলা হয়েছে। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের চেষ্টা করবে জামায়াতে ইসলামী। আমরা যদি নির্বাচিত হই, দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে আসবে।”

পথসভায় সভাপতিত্ব করেন কুতুবপুর ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর সভাপতি ইমদাদুল হক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির সোহেল রানা। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন কুতুবপুর ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর সাধারণ সম্পাদক পারভেজ হোসাইন।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, সদর উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর সাধারণ সম্পাদক জাব্বারুল ইসলাম মাস্টার, ১ নম্বর ওয়ার্ড রুদ্রনগরের সভাপতি শেরেগুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল রকিব, যুব বিভাগের সভাপতি সাহিরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক রকিব আলী, কোষাধ্যক্ষ তোফাজ্জল,

সদস্য খলিলুর রহমান, আজিজুল, জুলফিকারসহ স্থানীয় নেতাকর্মীরা।

গাংনীর কাজিপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষভাবে নিজ দলীয় নেতা নির্বাচন করলেন গাংনী উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র নেতাকর্মী। ভোটারদের সরাসরি ভোটে কাজিপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক সাহাবুদ্দিন ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন স্কুল শিক্ষক মাসুদ রানা।

আজ সোমবার দুপুরে হাড়াভাঙ্গা এইচ বি মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে কাজিপুর ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ড কমিটির সদস্যদের সরাসরি ভোটে তারা নির্বাচিত হন। দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনের পূর্বে আয়োজিত বিশাল জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক শিল্পপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

কাজিপুর ইউনিয়ন সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির সভাপতি রেজাউল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনসভায় বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক কমিটির সদস্য মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, আব্দুল আওয়াল, আলফাজ উদ্দীন কালু।

এছাড়াও জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাউসার আলীসহ বিভিন্ন ইউনিটের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি আব্দাল হকের সঞ্চালনায় সম্মেলনে কাজিপুর ইউনিয়নের ৯ টি ওয়ার্ড কমিটির মোট ৪শ ৫৯ ভোটরের মধ্যে ৪শ ৩২ জন তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন।

ভোট গ্রহণ শেষে সভাপতি পদে কাজিপুর গ্রামের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সাহাবুদ্দিন ২৬৬ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম

প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি নেতা বেতবাড়িয়া গ্রামের মঞ্জুরুল হক টকি পেয়েছেন ১৬৬ ভোট। অপরদিকে সাধারণ সম্পাদক পদে কাজিপুর গ্রামের মাসুদ রানা ২৭০ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কাজিপুর গ্রামের শহিদুল ইসলাম পিন্টু পেয়েছেন ১৫৮ ভোট।

মেহেরপুর কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজে শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা ও পুরস্কার বিতরণ

কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা ও বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০২৫ উপলক্ষে মেহেরপুর কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজে পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। আজ সোমবার সকাল ১১টার দিকে মেহেরপুর কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজ মাঠে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

মেহেরপুর কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ রেহানা ইয়াসমিন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ। বিশেষ অতিথি ছিলেন, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খায়রুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে প্লে শ্রেণীর মেহেরিমা আফরিন (আইরা), আবরার শাহরিয়ার রাফাত, নার্সারী শ্রেণীর আবরার খন্দকার (বিত্ত), সাইনা খাতুন, প্রথম শ্রেণীর এস এম সমন্বয়, সঞ্চিতা পাত্র, দ্বিতীয় শ্রেণীর শাহরিয়ার আলম, সারা মেহজাবিন, তৃতীয় শ্রেণীর জিয়ানা আফরিন, জান্নাত বিনতে আনিস, চতুর্থ শ্রেণীর কাজী ইয়াসির, ফারিহা সুলতানা সহ কৃতি শিক্ষার্থীদের মাঝে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

সহকারী শিক্ষক খন্দকার বদরুদ্দোজা এর সঞ্চালনায় এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন, সহকারী শিক্ষিকা সেলিনা আফরোজা, নাজমা আক্তার, বিথী খাতুন, শাহানা আক্তার, রওশন আরা, ফাতেমা খাতুন, শাহিনা আফরোজ সহ অভিভাবক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ।

মেহেরপুরে রিনিউয়েবল এনার্জি ফেস্ট উপলক্ষে সচেতনতামূলক র্যালি

রিনিউয়েবল এনার্জি ফেস্ট ২০২৫ উপলক্ষে মেহেরপুরে এক সচেতনতামূলক র্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার (২১ এপ্রিল) সকাল ১০টায় মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বর থেকে র্যালিটি শুরু হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে গিয়ে শেষ হয়।

সুবাহ সামাজিক উন্নয়ন সংস্থার আয়োজনে এবং একশনএইড বাংলাদেশ, বুয়েট ও জাস্ট এনার্জি ট্রানজিশন নেটওয়ার্ক বাংলাদেশ (জেটনেট-বিডি)-এর সহযোগিতায় এই র্যালির আয়োজন করা হয়।

র্যালিতে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও ক্যাব মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি রফিক-উল-আলম, ক্যাবের সাধারণ সম্পাদক ও আরটিভির জেলা প্রতিনিধি মাজেদুল হক মানিক, সোসাইটি ফর দি প্রোমোশন অব হিউম্যান রাইটস (এসপিএইচআর)-এর নির্বাহী পরিচালক আবু আবিদ, পল্লী জন উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক গোলাম কিবরিয়া, ব্র্যাকের জেলা প্রতিনিধি মনিরুল ইসলাম, হেলফ ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক দিলারা জাহান এবং অপাজিতা মেহেরপুর-এর নির্বাহী পরিচালক রেহেনা খাতুন।

র্যালিতে শতাধিক নাগরিক, নারী ও যুবা নেতৃবৃন্দ, পরিবেশকর্মী এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। তারা “সৌর-বায়ু শক্তিই ভবিষ্যৎ”, “জ্বালানি রূপান্তরে নারী-যুবার অংশগ্রহণ চাই” এবং “রিনিউয়েবল এনার্জি ফেস্ট ২০২৫ সফল হোক” এই ধরনের নানা স্লোগান লেখা প্ল্যাকার্ড ও ব্যানার বহন করেন।

র্যালি শেষে জেলা প্রশাসক কার্যালয় চত্বরে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বক্তারা নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রযুক্তিগত

সম্ভাবনা, নীতিগত সংস্কার এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব তুলে ধরেন।

সুবাহ সামাজিক উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মঈন-উল-আলম বলেন, “জ্বালানি খাতের টেকসই রূপান্তর শুধু সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়; এর জন্য সমাজের প্রতিটি স্তরের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন। এই র্যালি সেই প্রয়াসেরই সূচনা।”

কন্টক পথ পাড়ি দিয়ে যেতে চাই বহুদুর -ইয়াদুল মোমিন

সীমান্তবর্তী ছোট একটি জেলা মেহেরপুর। স্বাধীনতার সূতিকাগার খ্যাত ঐতিহাসিক জেলা মেহেরপুর। স্বাধীনতার ৫৪ বছর পেরিয়ে নতুন বাংলাদেশে এখনও বৈষম্য এ জেলার উন্নয়নে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, কলকারখানা, শিক্ষা ব্যবস্থাতেও এখনও বৈষম্যর শিকার হতে হচ্ছে প্রতিনিয়ত। এমন একটি জেলাতে অনেক নেই এর মধ্যে আছে আমাদের গৌরব করার মত একটি দৈনিক। আমি মেহেরপুর প্রতিদিনের কথা বলছি। পত্রিকাটির সম্পাদক হিসেবে কথা বলছি। একজন সংবাদকর্মী হিসেবে কথা বলছি। কথা বলছি মেহেরপুরের একজন নাগরিক হিসেবে। আমি এখন অবশ্যই গর্ব করি আমার জেলাতে একটি দৈনিক পত্রিকা আছে। যেখানে আছে অনেক অসঙ্গতি, কিন্তু অনেক অসঙ্গতির মধ্যেও প্রতিদিন একটি দৈনিক পাঠকের হাতে পৌছাচ্ছে পত্রিকা কতৃপক্ষ। ২০১৮ খ্রি. থেকে ২০২৫ খি.। সাত বছর পেরিয়ে ৮ম বছরে আমাদের প্রিয় পত্রিকা মেহেরপুর প্রতিদিন। অন্ধকারে আলো জ্বালিয়ে একটি বৈষম্যহীন, উন্নয়নশীল, অসঙ্গতিমুক্ত একটি জেলাকে আলোকিত করার চেষ্টা আমাদের প্রতিনিয়িত। কতটুকু পারবো, কতটুকু পেরেছি এ বিচারের ভার মেহেরপুরের আপামর জনগণের, আমাদের সকল স্তরের পাঠকের। তবে আমরা এ কন্টাকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করে বহু দুরে যেতে চাই।

আমরা গর্বিত আমরা একটি ইতিহাস গড়তে চলেছি। আমরা পেরেছি, আমাদের পারতেই হচ্ছে। আমাদের একটি মাত্র পথ খোলা রয়েছে, তা হলো সব অসঙ্গতিকে দুরে সরিয়ে আমাদের আলোকিত করতেই হবে। এ ধরণের একটি

চ্যালেঞ্জ নিতে পেরে মেহেরপুর প্রতিদিনের পরিবারের সদস্য হিসেবে আমি অহংকার করি।

অহংকারের এ যাত্রায় আমাদের সঙ্গে আছেন অগণিত পাঠক আর শুভানুধ্যায়ী। মেহেরপুরসহ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সর্বস্তরের মানুষের ভালোবাসা আমাদের প্রধান শক্তি। পাঠকসাধারণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা রেখে পত্রিকাটি আমরা প্রতিনিয়ত প্রকাশ করে যাচ্ছি। আমরা বিশ্বাস করি, পাঠকই আমাদের সবচাইতে বড় শক্তি, বড় শ্রদ্ধার জায়গা। তাদের হাতে প্রতিদিন একটি গ্রহণযোগ্য পত্রিকা তুলে দেওয়ার চেষ্টা ৭ বছর ধরে আমরা নিষ্ঠার সঙ্গে করে গেছি। আগামী দিনেও এই নিষ্ঠা দৃঢ়ভাবে বজায় রাখব।

‘জনগণের মুখপত্র’ এই স্লোগানের স্বাক্ষর রেখে যা কিছু জনগণের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে সে ধরণের সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে আমাদের সহকর্মীরা নিরলস কাজ করছে।

সংবাদের ভিতরকার সকল সত্য প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি। অসততা আমাদের স্পর্শ করতে পারেনি। তবে আমরা নিরপেক্ষ নই। আমরা মানুষের পক্ষে। প্রতিটি সাধারণ মানুষ, প্রতিটি সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পক্ষে আমাদের কলম চলবে।

শুধু পত্রিকা প্রকাশ করেই আমরা আমাদের দায়িত্ব শেষ করিনি। মেহেরপুরের খেলাধুলার প্রাণ ফিরিয়ে নিতে আমরা ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করেছি।পত্রিকার পাশাপাশি জাতীয় মানের টকশো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজের নানা অসঙ্গতি দুর করার জন্য কাজ করে যাচ্ছি।

মেহেরপুর প্রতিদিনের ৮ম বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী সফল হোক।

প্রসঙ্গ ‘কেয়া পাতার নৌকা’:

দাঙ্গা বিধধ্বস্ত বাংলাদেশের চিত্র -ড. শামস্ আল্দীন

মানব সভ্যতার ইতিহাস আসলে সংগ্রামেরই ইতিহাস। ইতিহাসের ছোট বড় দাঙ্গা যুদ্ধ সবই এই সংগ্রামের অন্তর্ভুক্ত। আর কথাসাহিত্যের কারবার যেহেতু মানুষ এবং মানুষের ছোট বড় সূক্ষ্ম ও অতি সূক্ষ্ম নানান বিষয় নিয়ে সেহেতু মানুষের জীবনে ঘটে যাওয়া এবং ঘটে চলা সংগ্রামের ইতিহাস ও কথাসাহিত্যে স্থান করে নেয় অনায়াসেই। বিশে^র সমস্ত দেশের কথাসাহিত্য সম্পর্কেই একথা সত্যি। বাংলা কথাসাহিত্য এর ব্যতিক্রম নয়। বাংলা কথাসাহিত্যের আদি থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত কথাসাহিত্যের দিকে চোখ রাখলে দেখা যায় বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত বিভিন্ন দাঙ্গা ও আন্দোলন বারেবারে বাংলা কথাসাহিত্যের বিষয় হিসেবে উঠে এসেছে। তবে এখনো পর্যন্ত যে দাঙ্গাটি বাংলা কথাসাহিত্যকে সব থেকে বেশি প্রভাবিত করেছে সেটি হল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তির মুহূর্তে দেশভাগকে কেন্দ্র করে হিন্দু- মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। এই দাঙ্গা এতটাই ভয়াবহ ও রক্তক্ষয়ী ছিল যে লক্ষ লক্ষ বাঙালিকে ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যেতে হয়েছে কোনরকম প্রস্তুতি ছাড়াই। এই দাঙ্গা এতটাই শক্তিশালী ছিল যে খুব অল্প সময়েই তা ব্যক্তি মানুষের মনকে ভেঙে খান খান করে দিয়েছে। এই দাঙ্গার অভিঘাত এতটাই সুদূরপ্রসারী ছিল যে দাঙ্গা শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও ব্যক্তি মানুষ তার অভিশাপ থেকে মুক্তি পায়নি। এই দাঙ্গা নারী, পুরুষ, শিশুসহ কেওই বাদ পড়েনি। ‘কেয়া পাতার নৌকা’ উপন্যাসে প্রফুল্ল রায় দাঙ্গা বিধ্বস্ত বাংলাদেশের সময়ের এই চালচিত্রকে অত্যন্ত বাস্তবসম্মতভাবে তুলে ধরেছেন। সেই বিষাক্ত সময় একটি নারীর জীবনকেও কীভাবে বিষিয়ে দিয়েছিল তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছেন তিনি। শুধু তাই নয় কীভাবে এই দাঙ্গা ব্যক্তি নারীর জীবনে ট্রাজিক পরিণতি নিয়ে এসেছে ‘ কেয়া পাতার নৌকা’ উপন্যাসে প্রফুল্ল রায় তা অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে অঙ্কন করেছেন।
দেশভাগ এবং দেশভাগের অভিঘাত প্রফুল্ল রায়কে যে জীবন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন করেছিল তা এতটাই গভীর ছিল যে সমগ্র জীবন তার প্রভাব থেকে তিনি বেরিয়ে আসতে পারেননি। মানুষের জীবনের সবথেকে সুন্দর সময় শৈশবের প্রায় পুরোটাই, ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি কাটিয়েছেন পূর্ববঙ্গে। এরপর দেশভাগের ফলে উদ্বাস্ত হয়ে তাঁকে চলে আসতে হয় কলকাতায়। সে অভিজ্ঞতা মোটেই ভাল ছিল না। একবস্ত্রে পূর্ববঙ্গ থেকে পালিয়ে চলে এসেছিলেন কলকাতায়। প্রতিমুহূর্তে ছিল খুন হয়ে যাওয়ার ভয়। পূর্ববঙ্গের একশ্রেণির মুসলমান তখন খুনের খেলায় মেতে উঠেছে। রাম দা নিয়ে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনেক মুসলমান প্রতিবেশী হিন্দুদের এই দুর্দিনে তাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। এদের সহযোগিতায় অতি কষ্টে প্রথমে জাহাজে এবং পরে রিফুজি স্পেশাল

ট্রেনে উদ্বাস্ত হিসেবে কলকাতায় প্রবেশ করেন তিনি। এরপর জীবিকার সন্ধানে ঘুরে বেড়িয়েছেন ভারতবর্ষের নানা প্রান্তে। খুব কাছ থেকে দেখেছেন দাঙ্গার কারণে উদ্বাস্ত মানুষের জীবন যন্ত্রণা। এই গভীর জীবন অভিজ্ঞতা সাহিত্যিক প্রফুল্ল রায়কে বরাবরই চালিত করেছে। ‘কেয়া পাতার নৌকা’ উপন্যাসটি লেখকের গভীর জীবন অভিজ্ঞতার ফসল। ‘কেয়া পাতার নৌকা’ উপন্যাসে লেখক অনেকগুলি চরিত্র অঙ্কন করেছেন। এই চরিত্রগুলি দাঙ্গা বিধ্বস্ত বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের ভয়াবহ পরিণতিকে পাঠকের সামনে তুলে ধরে। ‘কেয়া পাতার নৌকা’ উপন্যাসে বিনু, ঝিনুক, যুগল, লারমোর প্রভৃতি চরিত্র, তাদের ক্রিয়াকলাপ এব তাদের পরিণতি তো দাঙ্গা বিধ্বস্ত বাংলাদেশের মানুষের চরম পরিণতিকেই মনে করিয়ে দেয়। যে বিনু পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা থেকে গিয়ে পূর্ববঙ্গের মাটিকে অন্তর দিয়ে ভালো ভেসে ফেলেছিল সেই বিনুকেই বিনা দোষে কেবলমাত্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কাণে রাতের অন্ধকারে ব্যথাহত হৃদয়ে পালিয়ে চলে যেতে হল কলকাতায়। সত্যিই এই চিত্র মর্মান্তিক।
‘কেয়া পাতার নৌকা’ উপন্যাসে বহু চরিত্রের মধ্যেও আলাদা করে নজরে পড়ে ঝিনুক। বিনুর পাশাপাশি ঝিনুককে অত্যন্ত মমতা দিয়ে গড়ে তুলেছেন লেখক প্রথম থেকেই। ঝিনুক অভাগী। উপন্যাসের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রায় সবটা জুড়েই তার উপস্থিতি। উপন্যাস শেষ হয়েছে তার পালিয়ে যাওয়ার দৃশ্যের মাধ্যমে। মানব সংসারে এরকম কিছু চরিত্র থাকে, যারা জন্ম থেকেই অভাগী। বিত্তের কারণে নয় সম্পূর্ণ ভাগ্যের দোষে ঝিনুক সেরকমই একটি চরিত্র। হিন্দু মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কীভাবে তার জীবনকে তিলে তিলে শেষ করে দিয়েছে তারই এক অনবদ্য ছবি অঙ্কিত হয়েছে উপন্যাসটিতে। উপন্যাসের শুরুতে হেমনাথের সঙ্গে স্টিমার ঘাটে যখন ঝিনুককে প্রথম দেখা যায় তখন তার বয়স মাত্র আট।
“ছোট মেয়েটির চুল কোঁকড়া। নাকটি একটু বোঁচাই হবে। ফুলো
ফুলো নরম লালচে গাল। রূপোর কাজল লতার মতো চোখের কালো
মণি দু’টো টলটল করেছে। একটু নাড়া দিলেই টুপ করে ঝরে পড়বে। নীল ফ্রক লাল জুতোয়, মনে হয়, মোমের পুতুলটি”১
এই নিষ্পাপ কোমল পবিত্র ছোট্ট মেয়েটি তখনও জানে না যে কি ভীষণ দুঃখের ইতিহাস রচিত হতে চলেছে তার জীবনে। বাবা-মায়ের দাম্পত্য জীবনের মিলহীনতার খেসারত দিতে হয়েছে এই ছোট্ট মেয়েটিকে। ঝিনুকের মা অন্য কিছুর প্রতি প্রবল আকর্ষণে শুধু স্বামী ভবতোষকে ছেড়ে যায়নি, ছেড়ে চলে গেছে দুধের শিশু ঝিনুককেও। অভিব্যক্তি শুধু চোখে জল এনে দেয় না, হৃদয়কেও ভারাক্রান্ত করে তোলে। এরপর যখন ভবতোষ ও স্নেহলতার কথোপকথন আড়াল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে শুনে নিয়েছে তখন ঝিনুক সত্যিই জেনে গেছে যে তার মা আর ফিরবে না। তখন ছোট্ট ঝিনুকের কান্না পাঠককেও কান্নায় ভাসিয়ে দেয়।
ঝিনুকের জীবনের দুঃখের অধ্যায় এখানেই শেষ হয়ে যায়নি। ঝিনুক তখনো জানতো না যে কি ভয়ানক দুঃখ তার জন্য অপেক্ষা করে আছ্।◌ে

৪খ
অবনীমোহন বলে যান: “ কোনও আত্মীয়-স্বজন এমন মেয়েকে শেল্টার দেবে কিনা সন্দেহ। তুমি যদি আলাদা বাড়ি ভাড়া করে ওকে নিজের কাছে রাখতে চাও, হাজারটা প্রশ্ন উঠবে। লোকে জানতে চাইবে মেয়েটা কে। তোমার সঙ্গে তার কি সম্পর্ক। কী জবাব দেবে তখন? শুধু একটা পথ খোলা আছে–’
আবছা গলায় বিনু জিজ্ঞেস করল, ‘কি?’
‘যদি তুমি ওকে বিয়ে কর, সমস্যাটা মিটতে পারে। কিন্তু আত্মীয়রা তোমাদের ত্যাগ করবে। তা ছাড়া, এমন একটা মেয়েকে বিয়ে করার সাহস কি তোমার আছে?”৪গ
পিতার মুখ থেকে এই কথা শুনে মন খারাপ হয়ে গেল বিনুর। অনেক কথাই তখন মনে হল তার। বিষবাষ্পে-ভরা পূর্ব বাংলা থেকে কী নিদারুণ আতঙ্কের মধ্যে ঝিনুককে সীমান্তের এপারে নিয়ে এসেছে, তা শুধু সে-ই জানে। কিন্তু অবনীমোহন তাকে জীবনের সবচেয়ে কঠিন, সবচেয়ে দুরূহ সংকটের সামনে দাঁড় করিয় দিয়েছেন। বিপন্ন, দ্বিধাগ্রস্থ, শ^◌াসরুদ্ধ বিনু কী জবাব দেবে, ভেবে পেল না। অবনীমোহন বললেন: “একটা কথা ভেবে দেখতে পার। এ জাতীয় মেয়েদের জন্য গভর্নমেন্টের হোম আছে।
সেখানে আপাতত ঝিনুককে রাখা যেতে পারে।’
বিনু তখন কথা বলার অবস্থায় ছিল না। অবনীমোহন বলে যেতে থাকেন: ‘তুমি ঝিনুকের কাছে যাও।’ এক্ষুনি নয়, সময় নিয়ে বুঝিয়ে-সুজিয়ে ‘হোম’-এর
ব্যাপারটা বোলো।’
শরীর এবং মন কঠিন আঘাতে অসাড় হয়ে গেছে। নিজেকে ধীরে ধীরে টেনে তুলল বিনু। পাশের ঘরে এসে দেখল, সেটা একেবারে ফাঁকা। সে ডাকতে লাগল, ‘ঝিনুক–ঝিনুক–’ সাড়া নেই।
তেতলার অন্য ঘরগুলো আতিপাতি করে খুঁজল বিনু। কোথাও ঝিনুককে পাওয়া গেল না। সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে দোতলায়, তারপর একতলায় নেমে এলো সে। ঝিনুক কোথাও নেই।” ৪ঘ
ঝিনুকের জীবনের এই পরিণতি মেনে নিতে কষ্ট হয়। তার এই পরিণতি কোনমতেই প্রত্যাশিত ছিল না। ঝিনুকের তো কোন দোষ ছিল না। সে তো দাঙ্গাবিধ্বস্ত বাংলাদেশের অস্থির সময়ের শিকার। কোনভাবেই যেন এর থেকে তার নিস্তার নেই। শুধু ঝিনুকই নয় তার মতো হাজার হাজার নারীকে বাংলাদেশের দাঙ্গা বিধ্বস্ত সেই উত্তাল সময়ে এই নারকীয় যন্ত্রণার শিকার হতে হয়েছে। ইতিহাস বইয়ের পাতায় দু একটি শব্দের খোঁচায় হয়তো বা তার ইতিহাস তুলে রাখা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের নারীর জীবনে ঘটে যাওয়া সেই যন্ত্রণাময় ইতিহাস জীবন্ত হয়ে আছে সাহিত্যের পাতায়। যে সমস্ত সাহিত্যিক এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন প্রফুল্ল রায়। তাঁর ‘কেয়া পাতার নৌকা’ উপন্যাসের ঝিনুক দাঙ্গা বিধ্বস্ত বাংলাদেশের হাজার হাজার ত্রস্ত নারীর প্রতিনিধি।

লেখক: সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, সাউথইস্ট বিশ^বিদ্যালয়

মেহেরপুরের দুই কৃষ্ণ কবি - মুহাম্মদ রবীউল আলম

সাহিত্য ও সংস্কৃতির ভূবনে মেহেরপুরের রয়েছে সুদীর্ঘ ও গৌরবোজ্জ্বল এক ঐতিহ্য। এ অঞ্চলের মাটি যেমন রাজনৈতিক আন্দোলনে রেখেছে সাহসিকতার ছাপ, তেমনি কাব্যচর্চার ইতিহাসেও রেখেছে এক অনন্য পরিচিতি। এরই ধারাবাহিকতায় আমরা আজকের আলোচনায় মেহেরপুরের দু‘জন পুরোধা কবির কথা আলোচনা করবো। তারা হলেন মধ্যযুগের সাহিত্যের অনতম কবি কৃষ্ণহরি দাস ও নদীয়ার রাজা গিরিশচন্দ্রের সভাকবি কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী (১১৯৮ বঙ্গাব্দ – ১২৫১ বঙ্গাব্দ)। তারা তাদের কাব্যচর্চার মাধ্যমে মেহেরপুরকে সম্মানিত করেছেন। কবি কৃষ্ণহরি দাস মেহেরপুরকে আলোকিত করে যখন লেখেন ‘কৃষ্ণহরি দাস ভনে বাস মেহেরপুর’, তখন আমাদের গর্বে বুকটা ভরে যায়। অপর দিকে মেহেরপুরের বাড়ীবাঁকা গ্রামের সন্তান কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী যখন নদীয়ার রাজার সভাসদে মুখে মুখে কবিতা রচনা করে সবাইকে তাঁক লাগিয়ে দেন, তখন আমাদের আনন্দে মনটা নেচে উঠে। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত এই ধারায় এই দুই প্রাজ্ঞ কবির অবদান মেহেরপুরকে করেছে গর্বিত ও শ্রদ্ধাভাজন।

কৃষ্ণহরি দাস বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের শেষার্দ্ধের কবি ও গীতিকার। তিনি নদীয়ার বনগাঁও জন্ম নিলেও মেহেরপুরে বসবাস করতেন এবং মেহেরপুরে বসে কাব্য চর্চা করে গেছেন। এখানেই তিনি রচনা করেছেন অসংখ্য পুথি ও গীতিকাব্য। তার কাব্যে উঠে এসেছে বাউল-দরবেশ সংস্কৃতির প্রভাব, যেখানে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মমতের এক অনন্য সমন্বয় দেখা যায়।

সত্যপীরের পাঁচালী কাব্যের মধ্যে তার রচিত ‘বড় সত্যপীর ও সন্ধ্যাবতী কন্যার পুথি’ বৃহত্তর। তিনি বাউল-দরবেশ সম্প্রদায়ের শিষ্য। তার কবিতায় হিন্দু ও মুসলমানের সমন্নয়মূলক ভণিতা

বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তার কবিতায় দেখা যায় বিশেষ আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য সত্যপীরকে সংগ্রামী ভূমিকায় আসতে হয়েছে।

কৃষ্ণহরি দাস তার “ভনে বাস মেহেরপুর’ কবিতায় লিখেছেন-‘কৃষ্ণহরি দাস ভনে বাস মেহেরপুর/শতেক বন্দেগী মোর সত্যপীরের পায়/তোমার আদেশে গান কৃষ্ণহরি গায়।/তাহের মামুদ গুরু শামস নন্দন/হরনারায়ন দাসে লেখে রচে কৃষ্ণহরি/
শিরে যার সত্যপীর কন্ঠে বাগেশ্বরী/ পঞ্চমীর পুত্র আমি নাম কৃষ্ণহর ‘।

কৃষ্ণহরি দাস রচিত ‘বড় সত্যপীর ও সন্ধ্যাবতী কন্যার পুথি’-তে “অকুমারী সন্ধ্যাবতী” একটি ব্যতিক্রমধর্মী ও তাৎপর্যপূর্ণ নারী চরিত্র হিসেবে প্রতিভাত হয়েছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে মেহেরপুরে বসবাসকারী এই কবি হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের ধারক হিসেবে সত্যপীরকে যেমন তুলে ধরেছেন, তেমনি সন্ধ্যাবতীকেও করেছেন এক প্রতীকী নারী-অভিযাত্রী।

রসসাগর কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী উনিশ শতকের এক প্রখ্যাত কবি, যিনি বাংলা সাহিত্যে বিশেষ করে হাস্যরসাত্মক ও ছন্দনির্ভর কবিতা রচনার জন্য স্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি ১১৯৮ বঙ্গাব্দে মেহেরপুর জেলার বুড়িপোতা ইউনিয়নের বাড়ীবাঁকা গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কবির জন্মস্থানের ইতিহাস এবং সাহিত্যিক ধারা-উভয়ই মিশে রয়েছে তার জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে।

বাল্যকাল থেকেই কৃষ্ণকান্ত মুখে মুখে কবিতা রচনা করতে পারতেন। এই অসাধারণ প্রাকৃতিক প্রতিভা পরবর্তীতে পূর্ণতা পায় রাজসভায়। দস্যুদের হাতে পৈত্রিক সম্পদ হারিয়ে তিনি জীবিকার সন্ধানে কৃষ্ণনগরে আগমন করেন এবং তদানীন্তন নদিয়া রাজা গিরীশচন্দ্র তাকে মাসিক ত্রিশ টাকা বৃত্তিতে রাজপরিবারের সভাকবির পদে নিযুক্ত করেন।

তিনি সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দি ও ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। মুখে মুখে পয়ার, ত্রিপদী ও চতুষ্পদী ছন্দে কাব্য রচনায় তার ছিল অসামান্য দক্ষতা। কারও দ্বারা উপস্থাপিত যে-কোনো সমস্যা তিনি কবিতায় রূপ দিতে পারতেন মুহূর্তেই। রাজা গিরীশচন্দ্র তার প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তাকে “রসসাগর” উপাধিতে ভূষিত করেন।

রসসাগরের সাহিত্যজীবনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল ‘সমস্যা পূরান’, যেখানে তিনি মুখে মুখে সমস্যার সমাধান কবিতার মাধ্যমে

করেছেন। তার কাব্যে যেমন ছিল তীক্ষè বুদ্ধি ও রসবোধ, তেমনি ছিল গাঁথুনির নিখুঁত ছন্দ। সমসাময়িক কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে তার ছিল গভীর হৃদ্যতা। একে অপরের প্রশংসায় তারা যে ছন্দ ও কবিতার মাধ্যমে সাড়া দিতেন, তা আজও কাব্যপ্রেমীদের কাছে আকর্ষণীয় দৃষ্টান্ত।

কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী লিখেছেন, ‘বাঙ্গালীর মত কাঙ্গালী কে আর/বাঙ্গালীর জল বায়ু অতি চমৎকার,-/একবার সেবিলেই চক্ষু অন্ধকার।/ম্যালেরিয়া ছারখার করিল এ দেশ/ধনে প্রাণে ক‘রে দিল মানুষের শেষ।’

জীবনের শেষ পর্বে রসসাগর শান্তিপুরে তার কন্যার কাছে থাকতেন এবং সেখানেই ১২৫১ বঙ্গাব্দে তার মৃত্যু হয়। আজও বাংলা সাহিত্যের রসাত্মক ধারায় রসসাগরের নাম উজ্জ্বলভাবে উল্লিখিত হয়, যিনি ছিলেন একাধারে প্রতিভাবান কবি, ভাষাপন্ডিত এবং রাজসভার আনন্দদাতা।

কৃষ্ণহরি দাস ও রসসাগর কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী-এই দুই কবির সাহিত্য সাধনা কেবল মেহেরপুর নয়, বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারকেই করেছে সমৃদ্ধ। একজন মধ্যযুগের পুথিকবি হিসেবে ধর্মীয় সম্প্রীতির মূর্ত প্রতীক, অন্যজন আধুনিক যুগের প্রথমাধ্যে হাস্যরসাত্মক ছন্দের শিল্পী। তাদের জীবন ও কর্ম আমাদের সংস্কৃতির প্রাচীন শিকড়কে নতুন করে চিনতে ও গর্বিত হতে শেখায়। আজকের প্রজন্মকে তাদের সাহিত্য পাঠে আগ্রহী করে তোলা, কেবল অতীতকে জানার জন্য নয়-বরং আগামী দিনের সাহিত্য-সংস্কৃতির পথরেখা নির্মাণে সহায়ক হবে। মেহেরপুরের মুখ উজ্জলকারী মধ্যযুগের সাহিত্যের অনতম কবি কৃষ্ণহরি দাস ও নদীয়ার রাজা গিরিশচন্দ্রের সভাকবি কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ীকে আমরা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি।